بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৮ জুন ২০১৮, মোতাবেক ৮ এহসান ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন:

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

(সূরা আল্-আরাফ: ১৫৭)

এ আয়াতের অনুবাদ হলো, এবং তুমি ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই আমাদের জন্য কল্যাণ নির্ধারিত কর। নিশ্চয়ই আমরা তোমার দিকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসেছি। তিনি বললেন, আমার শাস্তি আমি যাকে চাই তার উপর আপতিত করি আর আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। অতএব আমি সেসব (কল্যাণ) তাদের জন্য অবধারিত করে দিব যারা তাকওয়া অবলম্বনকারী, যাকাত আদায়কারী এবং আমার নিদর্শনাবলীতে পূর্ণ ঈমান আনয়নকারী।

নিজ বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ রয়েছে; যেমনটি এ আয়াত থেকেও প্রতিভাত হয় যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার রহমত (দয়া ও কৃপা) সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। রহমতের অর্থ হচ্ছে, নম্র হওয়া, সদয় হওয়া এবং করুণা উদ্বেলিত হওয়া। অর্থাৎ বান্দাদের প্রতি তার কামল ব্যবহার এবং তাঁর সদয় দৃষ্টিপাতপূর্ণ আচরণের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। নিজ বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার দয়ার্দ্র ব্যবহারের কোন সীমা পরিসীমা নেই। আল্লাহ্ তা'লার দয়ার গুণ ও তাঁর দয়ার আচরণ এত বিস্তৃত যে, এটি সব কিছুর উপর ছেয়ে আছে। তাঁর রহমতের মধ্যে রহমানিয়ত এবং রহিমিয়্যত উভয়ই রয়েছে। না চাইতেই তিনি অগণিত জিনিস এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন– এটি হলো তাঁর রহমানিয়্যত। আর আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায়কারী, তাঁর নির্দেশাবলী পালনকারী এবং তাঁর কাছে সমর্পিত হয়ে যারা প্রার্থণা করে, তাদের ক্ষেত্রে তিনি রহিমিয়্যত গুণের বহিঃপ্রকাশ করেন। এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বান্দাকে শাস্তি দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। অনেকের এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, আযাব বা শাস্তিই যদি দিবেন তাহলে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করলেন কেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি (অর্থাৎ শাস্তি দেয়া) আমার উদ্দেশ্য নয়। হ্যাঁ, যারা নিজেদের অপকর্মে সীমা ছাড়িয়ে যায় তারা আমার শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত হয়। কিন্তু আমার এই যে শাস্তি তা-ও সাময়িক। আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশোধন এবং মানুষের মাঝে চেতনা জাগ্রত করা। এমনকি এমন এক সময় আসবে যখন দোযখবাসীরাও আমার ব্যাপক রহমত থেকে অংশ লাভ করবে আর তাদের শাস্তিরও অবসান ঘটবে। দোযখের শাস্তিও তারা তাদের অপকর্মের কারণেই পাবে। এরপর এটি তাদের সংশোধনের কারণে পরিণত হবে। অতএব লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই শাস্তিও এক ধরনের সংশোধন।

শাস্তির এই যুগও এক দৃষ্টিকোণ থেকে খোদার রহমত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বিচার দিবসের মালিকও বটে। এজন্য আমরা যাদেরকে বাহ্যত গুনাহগার বা পাপাচারী মনে করি এবং সেসব লোকদেরকে যাদেরকে আমরা পাপাচারী হিসেবে দেখতে পাই, তাদেরকেও তিনি তাঁর দয়া এবং ক্ষমার চাদরে আবৃত্ত করে শাস্তি ছাড়াই মুক্ত করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি আমাদেরকে পুন্যের পথে পরিচালিত হওয়ার প্রতি আগ্রহ যোগানোর জন্য এটি অবশ্যই বলে রেখেছেন যে, আমার দয়া সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে এবং তাদের প্রতি অবশ্যই আমি আমার দয়া প্রদর্শন করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার আয়াত সমূহের উপর ঈমান আনে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, যারা তাকওয়ার উপর পরিচালিত, যারা যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের উপর যথাযথভাবে এবং পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আমলকারী, আল্লাহ্ তা'লার আয়াত বা নিদর্শনাবলীর উপর পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনয়নকারী, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য হিসেবে আমি অবশ্যই আমার রহমতের চাদরে আবৃত করে রাখব।

এরপর অপর এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (সূরা আল্-আরাফঃ ৫৭) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমত নিশ্চয় সৎকর্মশীলদের নিকটতর। মুহসিন বা সৎকর্মশীল হলো তারা যারা সকল শর্তসহ নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে। অতএব যারা তাক্বওয়ার দাবি পূরণকারী, আল্লাহ্‌র বিধিবিধান পালনকারী, আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং যারা আল্লাহ্ তা'লার সামনে নিজেকে সমর্পণ করে– এমন ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার রহমত লাভ করবে। অতএব মু'মিনের আল্লাহ্ তা'লার আদেশ নিষেধের উপর আমল করার, তাকওয়ার উপর পরিচালিত হওয়ার, এবং ঈমানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। আর তখনই একজন মানুষ মু'মিন আখ্যায়িত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার রহমত তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালনকারীদের নিকটতর- আল্লাহ্ তা'লার এই ঘোষণা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আর আল্লাহ্ তা'লা নিজের জন্য এটি আবশ্যক করে নিয়েছেন এবং তিনি লিখে রেখেছেন যে, যদি তোমরা এমনটি কর তাহলে আমার রহমতের বিশালতা তোমাদেরকে আবৃত করে ফেলবে। কত দয়ালু এবং কৃপালু আমাদের খোদা। আমরা তো আল্লাহ্ তা'লার নগন্য বান্দামাত্র, বান্দা কীভাবে তার মালিকের কাছে অধিকার দাবি করতে পারে? কিন্তু আকাশ এবং পৃথিবীর সেই অধিপতি বলেন, যদি তোমরা তাকওয়ার উপর পরিচালিত হও, আমার বিধিনিষেধের উপর আমল করে আমার নিদর্শনাবলীর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার রহমতের যোগ্য বিবেচিত হবে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা প্রথম যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন তা হলো তাক্বওয়া। আর সত্যিকার অর্থে তাক্বওয়া সম্পর্কে যদি সঠিক বুৎপত্তি ও জ্ঞান লাভ হয় তাহলে অন্যান্য পুণ্যকর্ম আর ঈমানে পরিপূর্ণতা লাভ করা এর মাঝেই এসে যায়। এ সম্পর্কে এক জায়গায় হযরত মসীহে মাওউদ(আ.) বলেন,

মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য তাকওয়ার সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথে পরিচালিত হবার মাঝেই নিহিত। তাকওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথ হলো, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম ছাপ এবং আকর্ষণীয় গঠন ও গড়ন। আর জানা কথা, খোদা তা'লার আমানত আর ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারাবলীর প্রতি যথাসাধ্য যত্নবান হওয়া অর্থাৎ সঠিকভাবে পালন করা আর আপাদমস্তক মানুষের যত শক্তিবৃত্তি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে যেমন বাহ্যিকভাবে চোখ, কান,

হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আর অভ্যন্তরীণভাবে হৃদয় ও অন্যান্য শক্তিবৃত্তি এবং নৈতিক চরিত্র রয়েছে, এগুলো যতটুকু সম্ভব, যথাক্ষেত্রে ও যথাস্থানে প্রয়োজন অনুসারে এবং সঠিকভাবে এগুলো ব্যবহার করা, আল্লাহ্ নির্দেশিত যেসব আদেশ-নিষেধ রয়েছে তা যথাযথ এবং সঠিকভাবে পালন করা আর অবৈধ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা এবং শয়তানের গোপন আক্রমণ থেকে সাবধান থাকা, অন্যায় ব্যবহার থেকে এগুলোকে বিরত রাখা, আর শয়তান যেহেতু এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শক্তিবৃত্তির মাধ্যমে গোপনভাবে আক্রমণ করিয়ে থাকে তাই এ থেকে সাবধান থাকা– এগুলো হলো মানুষের কাজ, তবেই সে সত্যিকার অর্থে তাক্বওয়ার উপর পরিচালিত হতে পারে, তবেই সে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করতে পারে। তিনি বলেন, আর এর পাশাপাশি বান্দাদের প্রাপ্য অধিকারের প্রতিও তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে কেননা এটি সেই পদ্ধতি যার সাথে মানুষের সকল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সম্পৃক্ত। আর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে তাকওয়াকে লেবাস বা পোশাক নামে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব 'লেবাসুত্ তাক্বওয়া' পবিত্র কুরআনেরই একটি শব্দ। এটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিক শোভা তাক্বওয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। আর তাক্বওয়া হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার সকল আমানত এবং ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারাবলী, অনুরূপভাবে সৃষ্টির সকল আমানত আর তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারাবলী পালনের চেষ্টা করা অর্থাৎ এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকের ওপর যথাসম্ভব যেন আমল করার চেষ্টা করে। মানুষের যতটুকু শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে, তদনুসারে সে যেন এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের ওপর আমল করার চেষ্টা করে।

অতএব মানুষ যদি এই মান অর্জন করে তাহলে এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার রহমত তাঁর বান্দাদের জন্য অধিকার হিসেবে অবধারিত হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এটি নিজের জন্য আবশ্যক করে নেন। যেমনটি আমি বলেছি যে, অধিকার হিসাবে কিছু নেয়ার বান্দার কী যোগ্যতা আছে? আমরা রমজানের দিনগুলো অতিবাহিত করছি, যার শেষ সপ্তাহ এখন বাকি আছে মাত্র। এ বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, যখন রমজান মাস আসে তখন জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং দোযখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। এর দ্বারাও মু'মিনই লাভবান হয়ে থাকে। তারাই লাভবান হবে যারা সঠিকভাবে ঈমান আনে আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর উপর আমল করে। শয়তানের সাঙ্গপাঙ্গরা এই দিনগুলোতেও এসব অপকর্ম থেকে বিরত হয় না। পৃথিবীতে অগণিত বৃথা কর্ম ও নির্লজ্জতা প্রতিনিয়তই সম্পাদিত হচ্ছে, রমজানে এগুলো বন্ধ হয়ে যায় নি। অতএব এই সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য এবং তাকওয়ার উপর পরিচালিত ব্যক্তিদের জন্য, আল্লাহ্ তা'লার রহমত থেকে অংশ লাভকারীদের জন্য। আর সেই সুসংবাদ হল, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রহমতকে তোমাদের জন্য পূর্বের তুলনায় আরও বেশি ব্যাপকতর করেছেন, অতএব এর থেকে লাভবান হও আর আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের যথাসাধ্য চেষ্টা কর, তার বিধিনিষেধের উপর আমল করার চেষ্টা কর। এই দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে একবার মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের দাবি এবং নেকীর উদ্দেশ্যে রমজানের রাতে ওঠে এবং নামায পড়ে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর এটি আল্লাহ্ তা'লার ব্যাপক রহমতের বিকাশের একটি চিত্র যে, তোমরা একটি মাত্র চেষ্টা কর আর আমি অনেক গুণ বাড়িয়ে তোমাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। কতভাবেই

না তাঁর রহমানিয়্যত, রহিমিয়্যত আর রহমতের বিকাশ ঘটছে! অতএব তারা সৌভাগ্যবান যারা এ দিনগুলো থেকে লাভবান হয়। এরপর এটিও তাঁরই দান যে, এই শেষ দিনগুলোতে লায়লাতুল ক্বদর সন্ধানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যাতে দোয়া গৃহীত হবার দৃশ্য পূর্বের তুলনায় আমরা অধিক দেখতে পাই। এটিও আমাদের কোন অধিকার নয় এটি তাঁর দান মাত্র যার মাধ্যমে তিনি বান্দাকে নিজের নিকটতর করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন আর এটিও তাঁর রহমতের ব্যপকতারই পরিচায়ক।

এরপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রমজানের প্রথম দশক রহমত, মধ্যবর্তী দশক মাগফেরাত আর শেষ দশক হলো, আগুন থেকে নাযাত বা মুক্তি। রমজান মাসে রোযার পাশাপাশি মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধের ওপর পূর্বের তুলনায় অধিক আমল করে, নিজেদের ইবাদতকে যদি আরও বৃদ্ধি করে, নিজেদেরকে তাক্বওয়াকে সমৃদ্ধ করে, তাহলে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার রহমতের চাদরে পূর্বের তুলনায় আরও বেশি আবৃত হয়, কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যখন বান্দা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখে আর এ দিনগুলোতে আমার খাতিরে বিভিন্ন বৈধ কাজ করা থেকে বিরত থাকে, তখন এমন রোযাদারের প্রতিদান আমি স্বয়ং হয়ে থাকি। যখন আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং প্রতিদান হয়ে যান, তখন তার জন্য ক্ষমার উপকরণ হয়ে গেল আর যখন ক্ষমার ব্যবস্থা হয়ে যায়, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা মাগফেরাত, ক্ষমা এবং তওবা গ্রহণ করেন, তখন আগুন থেকেও মানুষ মুক্তি লাভ করে বা রক্ষা পায়। আর ইহকালীন আগুন থেকেও সে রক্ষা পায়, আর পরজগতের আগুন থেকেও সে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু শর্ত হলো, সে যেন একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে রোযা রাখে এবং আমলও করে। এরপর এই আমল তার জীবনের চীরস্থায়ী অংশে পরিনত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার রহমতে স্থায়ীভাবে তাদেরকে আবৃত করে রাখার কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লার রহমত শুধুমাত্র রমযানের প্রথম দশকেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি প্রথম দশক থেকে দ্বিতীয় দশকে এবং তৃতীয় দশকেও স্থানান্তরিত হয়। মানুষ যতদিন তাকওয়ার উপর পরিচালত হয়ে দৃঢ় ঈমানের সাথে কার্য সম্পাদন করতে থাকবে ততদিন তা মানুষের সাথে স্থায়ী থাকবে। অনুরূপভবে তার ক্ষমা কেবল মধ্যবর্তী দশ দিনের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় বরং রমজানের শেষ পর্যন্ত, এমনকি তার পরেও মানুষের সাথে থাকবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের আয়ু থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করবে। অনুরূপভাবে আগুন থেকে মানুষ কেবল এই দশদিনই সুরক্ষিত থাকবে না বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হয়ে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে রমযান অতিবাহিত করবে, পরবর্তীতেও সে আগুন থেকে দূরে থাকবে। নতুবা রমজানের পর যদি আমাদের ওপর সেই জাগতিকতাই প্রাধান্য পায় এবং তাকওয়া থেকে আমরা দূরে সরে যাই আর আল্লাহ্‌র বিধিনিষেধের বিষয়ে অমনোযোগী, ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শনের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে যাই তাহলে এটি তেমন-ই কথা হলো যেভাবে মানুষ নিজের জন্য একটি নিরাপদ দুর্গ গড়ে তোলে আর নিজেই তা আবার ভেঙে ফেলে। অতএব এই রমজানে আল্লাহ্ তা'লার রহমতের জন্য, পূর্বের তুলনায় অধিক রহমত লাভ করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি মোক্ষম সুযোগ করে দিয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম তিনি দান করেছেন। নতুবা আল্লাহ্ তা'লার রহমতও কয়েকদিনের জন্য সীমিত নয়

এবং তাঁর ক্ষমাও কয়েক দিনের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। আর তাঁর মাগফেরাত গৃহীত হবার কারনে আগুন থেকে যে মুক্তি লাভ, এটিও কয়েক দিনের জন্য বা কিছু দিনের জন্য সীমাবদ্ধ নয়।

অতএব এ বিষয়ের প্রতি আমাদের সর্বদা মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা উচিত। এ যুগে প্রতিটি পদক্ষেপে হযরত মসীহে মওউদ (আ.) আমাদেরকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন যে, আমরা কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে পারি এবং এর বাস্তবতা কি, কীভাবে আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হতে পারি আর কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর দয়ার চাদরে আবৃত করার উপকরণ সৃষ্টি করেন অথবা কীভাবে আমাদের কর্মের প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে দেন, কীভাবে আমাদের জন্য ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি করেন, কীভাবে আমাদের ক্ষমা লাভের জন্য চেষ্টা করা উচিত যেন তাঁর দয়া স্থায়ীভাবে আমাদের সাথে থাকে- এ সম্পর্কিত কিছু উদ্ধৃতি এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এবং তার ব্যাখ্যাও করব। আমি যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি যাকে চাই শাস্তি প্রদান করি এবং আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। অতএব যারা সকল প্রকারের শিরক, কুফর এবং অশ্লীলতা থেকে মুক্ত থাকে আর যাকাত প্রদান করে তাদের জন্য আমি স্বীয় রহমত অবধারিত করে দিব এবং তাদের জন্যও যারা আমাদের নিদর্শনাবলীর উপর পরিপূর্ণভাবে ঈমান রাখে। তিনি (আ.) এখানে তিনটি বাক্যে তাক্বওয়ার ব্যাখ্যা করেছেন। শিরক থেকে মুক্ত থাকা, কুফর থেকে মুক্ত থাকা এবং অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকা। বর্তমানে প্রতিটি পদে নির্লজ্জতার উপকরণ বিদ্যমান। টেলিভিশন, ইন্টারনেট এবং প্রচারমাধ্যমে অনর্থক ও বাজে বিভিন্ন বিষয় আমরা দেখতে পাই। তাই এগুলোতে অশ্লীল যেসব প্রোগ্রাম রয়েছে সেগুলো থেকে মুক্ত থাকাও আল্লাহ্র রহমতকে আকৃষ্ট করার কারণ হয়ে থাকে। রমজানের এ দিনগুলোতে রোযা রাখার জন্য মানুষকে ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠতে হয় এবং অন্যান্য ব্যস্ততাও আছে। তাই হয়ত অনেক মানুষ এসব বাজে কাজে জড়ায় না অথবা এ সমস্ত বাজে প্রোগ্রাম দেখে না বা এগুলো থেকে মুক্ত রয়েছে। কিন্তু এগুলো থেকে স্থায়ীভাবে বেঁচে থাকা আবশ্যক। এগুলো এমন বিষয়, যা সম্পর্কে আজকাল বিশেষ করে যুবসমাজ, বরং বড়দের বিষয়েও অভিযোগ আসে যে, তারা তাদের মন ও মস্তিষ্ক কলুষিত করছে। এর ফলে তাদের নৈতিক চরিত্রও নষ্ট হচ্ছে আর মানুষ ঈমান থেকেও দূরে সরে যাচ্ছে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর এ থেকে বাঁচার জন্য পূর্ণ মনোযোগের সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে আর এ জিনিসগুলোর সঠিক, যথাযথ এবং সতর্ক ব্যবহার করা উচিত।

এরপর আরেক জায়গায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, খোদা তা'লার রহমত সার্বজনীন এবং বিস্তৃত আর গজব বা ক্রোধ অর্থাৎ ন্যায়বিচারের বৈশিষ্ট্য কোন বিশেষত্বের কারণে সৃষ্টি হয়। এর অর্থ হলো মানুষ যখন ঐশী আইন লঙ্ঘন করে তখন এটি কার্যকর হয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যখন কাউকে শাস্তি প্রদান করেন তা এ জন্য যে, সে আল্লাহ্ তা'লার আইন লঙ্ঘন করেছে আর যেভাবে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তিও সংশোধনের নিমিত্তেই দেয়া হয় এবং অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার রহমত বা দয়াই প্রাধান্য লাভ

করে। অতএব পরিষ্কার কথা হলো, আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি যদি থেকে থাকে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কারো প্রতি যদি আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি অবতীর্ণ হয় তাহলে তা এ কারণে হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা নিজ রহমতকে প্রশস্ত করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ ঐশী শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত হয়। এর আরও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণীতে আসলে কোন প্রতিশ্রুতি থাকে না। শুধু এতটুকু থাকে যে, খোদা তা'লা স্বীয় কুদ্দুসিয়্যত বা পবিত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে অপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করেন। এরপর অপরাধী ব্যক্তি যখন তওবা, ইস্তেগফার, আহাজারি, হৃদয়ের বিগলন ইত্যাদির দাবি পূর্ণ করে দেয় তখন ঐশী রহমতের দাবি শাস্তির দাবির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর সেই শাস্তিকে নিজের মাঝে আচ্ছন্ন ও আবৃত করে নেয়। এটিই এই আয়াতের অর্থ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ অর্থাৎ 'রাহমাতি সাবাকাত গাজাবি' যার অর্থ আমার রহমত বা কৃপা আমার শাস্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। মানুষ যখন তওবা করে, ইস্তেগফার করে, আহাজারি করে, দোয়া প্রার্থনা করে আর এর দাবি যখন সে পূর্ণ করে দেয় বা এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তখন, তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দেয়াকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেন নি বরং নিজের জন্য তিনি যদি কিছু আবশ্যক করে থাকেন তবে তা হলো এমন লোকদের প্রতি দয়া করা। তখন তাঁর দয়া তাঁর শাস্তির দাবির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর শাস্তি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পর্দার আড়ালে লুকিয়ে যায়। এরপর তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার রহমত লাভ করার মাধ্যম হলো, তওবা ও ইস্তিগফার। ইস্তেগফারের দর্শন কী? এর অর্থ কী?–এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, ইস্তেগফারের প্রকৃত ও সত্যিকার অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিবেদন করা যে, মানবীয় কোন দুর্বলতা যেন প্রকাশ না পায় এবং খোদা যেন (মানবীয়) প্রকৃতিকে নিজ সহায়তা প্রদান করেন আর তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের গণ্ডিভুক্ত করে নেন। এস্তেগফার করার কারণ হলো, মানুষ যেহেতু দুর্বল তাই মানুষের মাঝে যে দুর্বলতা আছে তা যেন প্রকাশ না পায় এবং আল্লাহ্ তা'লা যেন নিজ শক্তি বলে মানব প্রকৃতিকে সহায়তা প্রদান করেন আর পাপ ও ভুলত্রুটি সম্পাদিত হওয়া থেকে যেন রক্ষা করেন। তিনি বলেন, এই শব্দটি 'গাফারা' থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ ঢেকে রাখা। অতএব এর অর্থ হচ্ছে খোদা তাঁর শক্তি বলে ক্ষমা প্রার্থনাকরী ব্যক্তির প্রকৃতিগত দুর্বলতা ঢেকে রাখেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইস্তেগফার করে তার যে প্রকৃতিগত দুর্বলতা আছে অর্থাৎ মানব প্রকৃতিতে যেসব দুর্বলতা থাকে তা যেন আল্লাহ্ তা'লা ঢেকে রাখেন এবং তা যেন প্রকাশ না পায় আর সেই দুর্বলতার কারণে তার দ্বারা যেন কোন পাপ সংঘটিত না হয়। কিন্তু এরপর সাধারণ মানুষের জন্য এই শব্দের অর্থ আরো ব্যাপক করে দেয়া হয়েছে আর এই অর্থও করা হয়েছে যে, খোদা যেন সংঘটিত পাপও ঢেকে রাখেন অর্থাৎ মানুষ যে পাপ ইতোমধ্যে করে বসেছে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তা-ও ঢেকে রাখেন, এর মন্দ প্রভাব থেকে যেন রক্ষা করেন, এর ফলে যে শাস্তি পাওয়ার ছিল তা থেকে যেন রেহাই দেন। কিন্তু এর প্রকৃত ও আসল অর্থ হলো, খোদা যেন তাঁর খোদায়ী শক্তি দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী অর্থাৎ যে ইস্তেগফার করে তাকে প্রকৃতিগত দুর্বলতা থেকে রক্ষা করেন এবং নিজ শক্তি হতে শক্তি দান করেন আর নিজ জ্ঞান হতে জ্ঞান দান করেন এবং নিজের আলোতে আলোকিত করেন।

কেননা খোদা মানুষকে সৃষ্টি করে তার থেকে পৃথক হয়ে যান নি বরং তিনি যেভাবে মানুষের স্রষ্টা এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ সকল শক্তিবৃত্তির স্রষ্টা অনুরূপভাবে তিনি মানুষের জন্য কাইয়্যুম খোদাও বটে। অর্থাৎ তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে নিজের বিশেষ সহায়তায় সুরক্ষাকারী। অতএব খোদা তা'লার নাম কাইয়্যুমও বটে, অর্থাৎ তিনি নিজ সহায়তায় তার সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন, এ কারণেই মানুষের জন্য আবশ্যক হলো যেভাবে সে খোদা তা'লার খালেকিয়্যত বা সৃষ্টিকরণ বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়েছে অনুরূপভাবে সে যেন নিজ সৃষ্টির (আত্মিক) গড়নকে খোদা তা'লার কাইয়্যুমিয়াত বা স্থায়িত্ব দানকারী বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে জন্ম দিয়ে ছেড়ে দেন নি। অতএব মানুষের সৃষ্টি প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে হয়ে থাকে। যদিও মানুষকে আল্লাহ্ তা'লাই সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অনুমতিক্রমেই মানুষ জন্ম গ্রহণ করে কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে মানবীয় চেষ্টা প্রচেষ্টা, উপায় উপকরণ এবং সৃষ্টির জন্য যে নিয়ম আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারণ করেছেন সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাকে অতিক্রম করতে হয়, এটি আবশ্যক। অতএব তিনি বলেন, জন্মের ক্ষেত্রে যেভাবে মানুষের চেষ্টা প্রচেষ্টা রয়েছে এবং এরপর আল্লাহ্ তা'লা এর ফলাফল সৃষ্টি করেন, তাই এটিও আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর পরিচালিত হওয়ার জন্য, সেগুলোর ওপর আমল করার জন্য খোদার যে কাইয়্যুম বৈশিষ্ট্য রয়েছে তারও বহিঃপ্রকাশ ঘটা উচিত, তোমাদের তা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। তাঁর নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হওয়ার জন্য তাঁর কাছে দোয়া এবং ইস্তেগফার করার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কাইয়্যুমিয়ত বৈশিষ্ট্যের অধীনে সেই শক্তিও দান করেন যার ফলে মানুষ তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর পরিচালিত থাকতে পারে। এই বিষয়টিকে আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

অতএব মানুষের জন্য এটি একটি স্বভাবজ প্রয়োজন ছিল, যে জন্য ইস্তেগফারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এদিকেই পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (সূরা আল বাকারাঃ ২৫৬)। অতএব খোদা স্রষ্টাও এবং কাইয়্যুমও বটে, আর মানুষ যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন খোদার স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য পূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু কাইয়্যুমিয়তের কাজ চিরকালের জন্য। মানুষ জন্ম নেয়ার পর খোদা তা'লার খালেকিয়্যত বা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য পূর্ণতা পেয়েছে কিন্তু কাইয়্যুমিয়তের কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বেঁচে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে থাকবে। এজন্য চিরস্থায়ী ইস্তেগফারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই কাইয়্যুমিয়ত বৈশিষ্ট্য লাভের জন্য অনবরত ইস্তেগফারে রত থাকা প্রয়োজন। মোট কথা খোদা তা'লার প্রতিটি সিফত বা বৈশিষ্ট্যের জন্য এটি কল্যাণ রয়েছে, আর ইস্তেগফার কাইয়্যুমিয়ত বৈশিষ্ট্যের কল্যাণ লাভ করার একটি মাধ্যম। ইস্তেগফার কাইয়্যুমিয়াত বৈশিষ্ট্য থেকে কল্যাণ লাভ করার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার কাইয়্যুমিয়ত বৈশিষ্ট্য থেকে যদি কল্যাণ লাভ করতে হয় তাহলে ইস্তেগফার কর যেন আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে যে শক্তিবৃত্তি দিয়েছেন, যে শক্তিসামর্থ্য দিয়েছেন, যে যোগ্যতা বা নৈপুণ্য দিয়েছেন সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা অনুযায়ী চালানোর তৌফিক দান করেন। তিনি বলেন, সূরা ফাতেহার এই আয়াতেও এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, 'ইয়্যাকানাবুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তাঈন' অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই এ কাজের সাহায্য প্রার্থনা করি যে, তোমার কাইয়্যুমিয়ত এবং রোবুবিয়্যত যেন

আমাদেরকে সাহায্য প্রদান করে এবং আমাদেরকে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করে। এমন যেন না হয় যে, দুর্বলতা প্রকাশ পাবে এবং আমরা ইবাদত করা থেকে বঞ্চিত হব। অতএব এই হচ্ছে সেই মৌলিক বিষয় যা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিগোচর থাকা চাই। শুধু এ কথা বলা যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে তাই যা ইচ্ছা কর, পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লার কাছে রহমত এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিব, এটি সঠিক নয়। আল্লাহ্ তা'লা রহমতকে সেসব লোকের ক্ষেত্রেও নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছেন যারা তাঁর পানে আসে, যারা তাঁর বিধিনিষেধ পালন করে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এরপর ইস্তেগফারের বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, অনেক মানুষ এমন হয়ে থাকে যারা পাপ সম্পর্কে অবহিত থাকে, আবার অনেকে এমন আছে যারা পাপ কী তা জানেই না, পাপ করে বসে কিন্তু অনুভবই করে না, অনুভূতিহীন হয়ে থাকে অথবা ভুলবশত পাপ করে বসে আর বুঝতেই পারে না যে, পাপ করেছে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা সব সময়ের জন্য ইস্তেগফারের ব্যবস্থা করিয়েছেন যাতে মানুষ প্রত্যেক পাপের জন্য তা প্রকাশ্য হোক বা গোপন, সে জানুক বা না জানুক, আর হাত, পা, মুখ, নাক, কান, চোখ এবং সব ধরনের গুণাহ থেকে সে যেন ইস্তেগফার করতে থাকে। শরীরের যত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে তার কোনটি দ্বারাই যেন এই ধরনের কোন গুণাহ সংঘঠিত না হয়, এর জন্য ইস্তেগফার করতে থাকে। তিনি বলেন, আজকাল আদম (আ.)-এর দোয়া পাঠ করতে থাকা উচিত আর তা হচ্ছে رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (সূরা আল আরাফ : ২৪) এই দোয়া শুরতেই গৃহীত হয়েছে যার অর্থ হলো, হে আল্লাহ্! আমি আমার প্রাণের ওপর যুলুম ও অন্যায় করেছি, এখন তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, আমাদের প্রতি দয়ার্দ্র না হও তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাব। তিনি বলেন, এই দোয়া প্রারম্ভেই গৃহীত হয়েছে, উদাসীনতায় জীবনযাপন করো না। যে ব্যক্তি উদাসীনতায় জীবনযাপন করে না তার ক্ষেত্রে কখনোই এই আশা করা যায় না যে, সে কোন অসহনীয় বিপদে জর্জরিত হবে। ঐশী অনুমতি ছাড়া কোন বিপদ আসতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে আমার প্রতি এই দোয়া এলহাম করা হয়েছে যে, **রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদেমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনি ওয়ান সুরনি ওয়ার হামনি**।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার হেফাযত লাভের জন্য, তাঁর সাহায্য ও সহায়তা লাভের জন্য, তাঁর কৃপাভাজন হওয়ার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা, ইস্তেগফার এবং দোয়া করা আবশ্যক। ইস্তেগফার এবং তওবা আমরা এই দুটি শব্দ ব্যবহার করে থাকি। এ দুইয়ের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্য সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, ইস্তেগফার এবং তওবা দুটি ভিন্ন জিনিস। একটি কারণে তওবার ওপর ইস্তেগফার অগ্রগণ্য অর্থাৎ এর প্রাধান্য রয়েছে, কেননা এটি প্রথমে এসেছে অর্থাৎ ইস্তেগফার তওবার পূর্বে এসেছে। এছাড়া ইস্তেগফার হচ্ছে সাহায্য এবং শক্তি যা খোদা থেকে লাভ করা হয়। অর্থাৎ পাপ থেকে বাঁচার জন্য ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সাহায্য এবং শক্তি লাভ করা হয় যাতে মানুষ পাপ থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর তওবা হলো নিজের পায়ে দাঁড়ানো। অর্থাৎ রক্ষা পাবার পর অবিচলতার সাথে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর যে ইস্তেগফার করা হয়েছে, নিজের পাপ হতে মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেছে, এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নাম তওবা। কাজেই এটি অর্থাৎ দোয়া ও তওবা এজন্য করা হয় যে, হে আল্লাহ্! ক্ষমা লাভের যে দোয়া আমরা

করেছি আমাদেরকে তুমি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ, আগুন থেকে যে মুক্তি দিয়েছো তা যেন এখন চিরস্থায়ী মুক্তি হয়। আমাদের কোন কাজ অথবা আমরা যে সমস্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছি তা যেন কখনোই তোমাকে অসন্তুষ্ট না করে যাতে আমরা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে না যাই, এজন্য তওবা করা হয়। পাপ থেকে ক্ষমা লাভের জন্য ইস্তেগফার করেছি আর 'ওয়া আতুবু ইলাইহে' বলার কারণ হলো তুমি যেন আমাদেরকে এর ওপর প্রতিষ্ঠিতও রাখ, যাতে আমরা আমাদের পাপ থেকে মুক্ত থাকি এবং সর্বদা তোমার মাগফিরাত অর্জন করতে থাকি আর আগুন থেকে আমরা যেন সর্বদা মুক্তি পেতে থাকি। তিনি বলেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার বৈশিষ্ট যে, যখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে মানুষ সাহয্য প্রার্থনা করবে তখন খোদা তা'লা তাকে একটি শক্তি দান করবেন আর সেই শক্তি লাভের পর মানুষ নিজের পায়ে দণ্ডায়মান হবে এবং বিভিন্ন পুণ্য করার জন্য তার মাঝে এক শক্তি সৃষ্টি হবে যার নাম হলো 'তুবু ইলাইহে'। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ ইস্তেগফারের পরেই তওবার তৌফিক লাভ করে। যদি ইস্তেগফার না করা হয় তাহলে নিশ্চিতরূপে স্মরণ রেখো, তওবার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপর তোমরা যদি এভাবে ইস্তেগফার কর আর পুনরায় তওবা কর তাহলে এর ফলাফল যা দাঁড়াবে তা হলো, يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى (সূরা হূদ: ৪)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সর্বোত্তম উপকরণ প্রদান করবেন। তিনি (আ.) বলেন, এভাবেই আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত বহমান রয়েছে। তোমরা যদি ইস্তেগফার এবং তওবা কর তাহলে নিজেদের পদমর্যাদা লাভ করবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি সীমানা নির্ধারিত আছে যাতে সে উন্নতি করতে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি নবী, রসূল, সিদ্দিক এবং শহীদ হতে পারে না কিন্তু তার জন্য যতটুকু পদমর্যাদা নির্ধারিত রাখা আছে, যার জন্য যেখানে পৌঁছানো নির্ধারিত, তা অর্জন করার জন্য তাকে চেষ্টা করতে হবে এবং তা ইস্তেগফার এবং তওবার মাধ্যমেই করতে হবে। তওবার আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, পরিষ্কার কথা হলো, আরবী অভিধানে প্রত্যাবর্তন করাকে তওবা বলা হয়। এজন্যই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার নামও 'তাওয়াব' রাখা হয়েছে অর্থাৎ অনেক বেশি প্রত্যাবর্তনকারী, এর অর্থ হচ্ছে যখন মানুষ পাপ পরিত্যাগ করে খাঁটি হৃদয়ে খোদা তা'লার প্রতি সমর্পিত হয় তখন খোদা তা'লা তার দিকে আরো দ্রুত গতিতে ছুটে আসেন আর এটি প্রকৃতির নিয়ম সম্মত একটি বিষয়। কেননা খোদা তা'লা যেহেতু মানুষের প্রকৃতিতে এ বিষয়টি প্রচ্ছন্ন রেখেছেন যে, মানুষ যখন নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে অন্য কোন মানুষের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে তখন তার হৃদয়ও তার জন্য কোমল হয়ে যায় তাহলে বিবেক এটি কীভাবে গ্রহণ করতে পারে যে, বান্দা নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে খোদা তা'লার প্রতি প্রত্যবর্তন করবে আর খোদা তার দিকে মোটেও ফিরে তাকাবেন না। বরং খোদা সেই সত্তা যাঁর অত্যন্ত দয়ালু এবং কৃপালু হওয়া সাব্যস্ত, তিনি বান্দার প্রতি অনেক বেশি প্রত্যাবর্তন করেন বা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার নাম 'তাওয়াব' রাখা হয়েছে অর্থাৎ অনেক বেশি প্রত্যাবর্তনকারী। অতএব বান্দার ফিরে আসা অনুশোচনা, অনুতাপ, বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে হয়ে থাকে আর খোদা তা'লার দৃষ্টিপাত হয় বা প্রত্যাবর্তন হয় রহমত ও মাগফিরাতের সঙ্গে। খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্যের মাঝে যদি রহমত বা দয়া না থাকত তাহলে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারত না। তিনি বলেন, পরিতাপ! এসব মানুষ খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগ

নিবদ্ধ করে নি এবং নিজেদের সব কিছুর ভিত্তি রেখেছে নিজেদের আমল এবং কর্মের ওপরে। যারা মনে করে যে, নিজেদের কর্ম দ্বারাই আমরা সব কিছু অর্জন করব, কিন্তু সেই খোদা, যিনি কারো কোন কর্ম ছাড়াই হাজার হাজার নেয়ামত মানুষের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য কী এটি সমীচীন হতে পারে যে, দুর্বল প্রকৃতির মানুষ যখন নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে আর এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করে যেন সে মরেই যায় আর পূর্ববর্তী অপবিত্র পোশাক নিজের শরীর থেকে খুলে ফেলে এবং তার ভালোবাসার অগ্নিতে নিজেকে জ্বালিয়ে ফেলে তার পরেও খোদা তার প্রতি দয়ার সাথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন না? এর নাম কি খোদার বিধান হতে পারে? তিনি (আ.) এখানে সেসব লোকদের উত্তর দিচ্ছেন যারা বলে যে, আল্লাহ্ তা'লা দয়ার সাথে মানুষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন না যদিও মানুষ দোয়া ও ইস্তেগফার করতে করতে নিজেদের অবস্থা মৃতবত করে ফেলে আর মনে হয় যেন তারা মরেই গেছে আর নিজেদের শরীরের পূর্ববর্তী অপবিত্র পোশাকও শরীর থেকে খুলে ফেলে, নিজেদেরকে পবিত্র করে, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার আগুনে জ্বলতে আরম্ভ করে তবুও কি আল্লাহ্ তা'লা দয়ার সঙ্গে তাদের দিকে ফিরে তাকাবেন না? এটি এমন লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে যারা মিথ্যা বলে, **'লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন'**। তিনি (আ.) বলেন, এটি কখনোই হতে পারে না যে, বান্দা নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে আর খোদা তা'লা তাকে কিছুই দান করবেন না, এটি আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদার পরিপন্থি কথা এবং আল্লাহ্ তা'লার এই ঘোষণার পরিপন্থি যে, আমার রহমত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এটি তাঁর বিধান পরিপন্থি। আমি যেমনটি বলেছি, এটি তাঁর রহমত ব্যাপক ও বিস্তৃত হওয়ার পরিপন্থি কথা। কিন্তু মানুষকে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে তা-ও এভাবে যে, সে যেন এক মৃত্যু বরণ করেছে আর তার পূর্ববর্তী পাপের অপবিত্র পোষাক শরীর থেকে খুলে ফেলতে হবে এবং তাঁর ভালোবাসার আগুনে দগ্ধ হতে হবে। এই কথাটি গভীর মনোযোগের দাবি রাখে, তিনি বলেন, যদি এমনটি করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করেন বা মানুষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন যে, মানুষ তা ভাবতেও পারে না।

অতএব এই হলো ক্ষমা প্রার্থনা করার সেই মান যা বান্দাকে আল্লাহ্ তা'লার রহমতের অধীকারী করে, সেই অধিকার, যা প্রদান করাকে আল্লাহ্ তা'লা নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন। তিনি (আ.) সত্যিকার এবং যথাযথ তওবার বিভিন্ন শর্তের কথাও উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ এটি অর্জনের জন্য মানুষকে কীরূপ এবং কীভাবে চেষ্টা সাধনা করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, সত্যিকার তওবা করার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্ত হচ্ছে নিজের মনমস্তিষ্ককে সেসব বিষয় থেকে পবিত্র করা যার ফলে নৈরাজ্যপূর্ণ চিন্তাধারা সৃষ্টি হতে পারে। আর এটি ততক্ষণ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেসব মন্দের এক ভয়ানক এবং বিভীষিকাময় চিত্র তোমাদের মস্তিষ্কে সৃষ্টি না হবে। যদি এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে, এ সম্পর্কে যদি তোমাদের মাথায় এক ঘৃণ্য চিত্র অংকন না কর তাহলে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন। প্রথম শর্ত হলো এসব বিষয় নিজেদের মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। চেষ্ট প্রচেষ্টা করে এগুলোর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। দ্বিতীয়ত কোন মন্দ কাজ বা ভুল কাজের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়ার পর অনুতাপ ও অনুশোচনা করা প্রয়োজন। মানব হৃদয়ে যখন এই ধারণা জাগে তাৎক্ষণিভাবে তার লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া চাই। হৃদয়ে যেন এই চেতনা সৃষ্টি

হয় যে, মন্দের যে আকর্ষণে আমি ছুটছি, তা সাময়িক এবং এগুলো আমার জীবনকে ধ্বংস করে ছাড়বে আর এক সময় এসে এগুলো শেষ হয়ে যাবে। এগুলো সাময়িক সুখভোগ মাত্র। তাই নিজের বিবেকের কথা শুনতে হবে। মানুষের বিবেক তাকে প্রতিনিয়ত সতর্ক করে যে, এটি মন্দ জিনিস আর এটি ভালো জিনিস। এ ধরনের চিন্তাভাবনা যখন আপনাদের মাঝে জাগ্রত হবে আর যখন বিবেকের ধ্বনি বা আওয়াজ শুনবেন তখন ধীরে ধীরে মন্দ থেকেও আপনারা মুক্তি লাভ করতে পারবেন। আর তৃতীয়ত আপনাদের মাঝে যেন দৃঢ় সংকল্প থাকে যে, আমি এসব মন্দের ধারে কাছেও ঘেঁষবো না। অতঃপর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য পরিপূর্ণ এবং দৃঢ় সংকল্প যদি থাকে আর দোয়াও যদি করা হয় তবেই সকল মন্দ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবে আর বিভিন্ন পুণ্য সেই জায়গা দখল করতে আরম্ভ করবে। তিনি (আ.) যে বলেছেন, অপবিত্রতার পোশাক পরিত্যাগ করতে হবে- এর অর্থ এটিই যে, পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা সাধনা কর আর এর ওপর দৃঢ় সংকল্পের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাক তবেই তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দয়ার যোগ্য হবে।

ইস্তেগফার এবং তওবার মাধ্যমে আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, তওবা মানুষের জন্য কোন অতিরিক্ত বা অকল্যাণকর বিষয় নয় আর এর প্রভাব শুধু কেয়ামতের জন্যই সীমিত নয় বরং এর ফলে মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া দু'টোই নিশ্চিত হয় আর সে ইহ ও পর উভয় জগতে শান্তি ও সত্যিকার প্রাচুর্য লাভ করে। দেখ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ **(সূরা আল বাকারাঃ ২০২)**

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ এবং সুখ শান্তির উপকরণ দান কর এবং পরজগতেও সুখ শান্তির উপকরণ দান কর, আর আমাদেরকে আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর। দেখ! সত্যিকার অর্থে 'রাব্বানা' শব্দটিতে তওবার প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা 'রাব্বানা' শব্দটি দাবি করে যে, সে অন্যান্য যেসব প্রভু পূর্বে বানিয়ে রেখেছিল, তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে প্রকৃত প্রভুর দিকে যেন ফিরে আসে। আর এই শব্দটি সত্যিকার বেদনা এবং নম্রতা ছাড়া মানুষের হৃদয় থেকে উত্থিত হতেই পারে না। মানুষ যখন 'রাব্বানা' বলে, তখন সে শুধুমাত্র মুখ দ্বারাই বলে না, বরং হৃদয় থেকে এই দোয়া উদ্ভূত হয়। 'রাব্বানা' তখনই বলবে, যখন হৃদয় থেকে উৎসারিত হবে। অনেকে বাহ্যিকভাবেও 'রাব্বানা' বলে থাকে, কিন্তু এই দোয়ার আসল মর্ম সেটি, যখন তা হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়। তিনি বলেন, 'রব' তাকে বলা হয়, যিনি ক্রমান্বয়ে পূর্ণতায় পৌঁছান এবং প্রতিপালন করেন। আসলে মানুষ নিজের হৃদয়ে অনেক কল্পিত প্রভু বানিয়ে রেখেছে। অনেকে নিজদের ধোকা এবং প্রতারণার ওপর আস্থা রাখে, যেন এটিই তার প্রভু, কারো যদি নিজ জ্ঞান অথবা শক্তির বড়াই থাকে তাহলে সেটিই তার প্রভু, কারো যদি সৌন্দর্য বা ধন-সম্পদের গরিমা থাকে তাহলে সেটিই তার প্রভু প্রতিপালক। মোটকথা এ ধরনের শতসহস্র উপকরণ তার সঙ্গে লেগে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সবগুলোকে পরিত্যাগ করে এদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এক-অদ্বিতীয় এবং সত্যিকার খোদার সমীপে মস্তক অবনত না করবে আর 'রাব্বানা'র হৃদয় বিগলিত আওয়াজ তাঁর দরবারে সমর্পিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার রবকে সে চিনে নি। অতএব এইরূপ বিগলিত হৃদয়ে আর উচ্ছ্বসিত প্রাণে যখন নিজের পাপ

স্বীকার করে তওবা করে এবং নিজ প্রভুকে সম্বোধন করে বলে ‘রাব্বানা’ অর্থাৎ সত্যিকার এবং প্রকৃত উপাস্য তুমিই ছিলে কিন্তু আমরা ভুলক্রমে অন্যত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এখন আমি সেইসব মিথ্যা প্রতিমা এবং মিথ্যা উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করছি এবং খাঁটি হৃদয়ে আর নিষ্ঠার সাথে তোমার প্রতিপালক বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং তোমার দরবারে ফিরে আসছি। মোটকথা এগুলো ছাড়া খোদাকে নিজেদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করা কঠিন। মানুষের হৃদয় থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য কল্পিত ‘রব’ এবং তাদের মূল্য, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বেরিয়ে না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যিকার ‘রব’ এবং তাঁর প্রতিপালক বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করতে পারে না। অনেকে মিথ্যাকেই নিজেদের প্রভু বানিয়ে রেখেছে। তারা মনে করে যে, মিথ্যা ছাড়া আমাদের জীবনযাপন করা কঠিন। অনেকে চুরি, ডাকাতি এবং প্রতারণাকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে রেখেছে। তাদের বিশ্বাস হলো, এগুলো ছাড়া নিজেদের অবলম্বনের আর কোন পথ খোলা নেই। অতএব তাদের প্রভু প্রতিপালক হচ্ছে সেসব জিনিস। তিনি বলেন, এমন মানুষ, যারা নিজেদের প্রতারণা এবং শঠতার ওপর বিশ্বাস রাখে, খোদা তা’লার কাছে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করার এবং দোয়া করার প্রয়োজনই বা কী? দোয়ার প্রয়োজন তো তারই হয়ে থাকে, যার সকল পথ বন্ধ আর এই দ্বার ছাড়া অন্য কোন দ্বার খোলা থাকে না, তার হৃদয় থেকেই ‘রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া’র দোয়া উদ্ভূত হয়। এমনভাবে দোয়া করা শুধু সেইসব লোকের কাজ যারা কেবলমাত্র খোদাকেই নিজেদের প্রভুপ্রতিপালক মনে করে আর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তাদের প্রভুর সামনে অন্যসব প্রভু মিথ্যা ও তুচ্ছ। তিনি বলেন, আগুন অর্থ শুধু সেই আগুনই নয়, যা কিয়ামত দিবসে প্রকাশ পাবে বরং এই পৃথিবীতেও যখন একজন মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করে, সে দেখতে পায় যে, পৃথিবীতে হাজার ধরনের আগুন রয়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যায় যে, বিভিন্ন ধরনের আগুন পৃথিবীতে বিদ্যমান, বিভিন্ন প্রকার শাস্তি, ভয়, হত্যা, দারিদ্রতা, ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধি, ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও দুর্যোগ, হাজার প্রকার দুঃখ, কষ্ট, স্ত্রী-সন্তান ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্ন কষ্ট, আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন, মোটকথা এগুলো সবই আগুন। অতএব মু’মিন দোয়া করে যে, সকল প্রকার আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর, আমরা যখন তোমার আঁচল ধরেছি, তখন সেই সব দুঃখ-বেদনা, যা মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলে আর মানুষের জন্য যা আগুন সদৃশ্য তা থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার জামা’তকে এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন যে, আমাদের জামা’তকে অধিক সংখ্যায় এই দোয়া পাঠ করা উচিত যে, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা আল বাকারা: ২০২)

অতএব, আমাদেরও এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত, যাতে আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে তাঁর রহমতের চাঁদরে আবৃত রাখেন এবং সব ধরনের ইহ জাগতিক ও পারলৌকিক আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে খোদা তা’লা যে এ কথা বলেছেন, এর সারাংশ হলো- হে আমার বান্দাগণ! আমার বিষয়ে তোমরা নিরাশ হয়ো না। আমি রহীম, করীম, সাত্তার এবং গফুর আর সবচেয়ে বেশি তোমাদের প্রতি দয়ালু। এতবেশি দয়া তোমাদের প্রতি আর কেউ করবে না, যতটা আমি করে থাকি। তোমরা আমাকে নিজ পিতার চেয়েও অধিক ভালোবাস, কেননা সত্যিকার অর্থে

আমিই ভালোবাসা পাওয়ার সবচেয়ে বেশি যোগ্য। তোমরা যদি আমার পানে আস, তাহলে আমি তোমাদের সকল পাপ ক্ষমা করে দিব আর তোমরা যদি তওবা ও অনুশোচনা কর, তাহলে তা আমি গ্রহণ করব। আর যদি তোমরা আমার কাছে ধীর গতিতে আস, তাহলে আমি তোমাদের কাছে ছুটে আসব। যে ব্যক্তি আমাকে সন্ধান করবে, সে আমাকে পাবে আর যে আমার প্রতি সমর্পিত হবে, সে আমার দ্বার উন্মুক্ত দেখতে পাবে। আমি তওবাকারীদের পাপ ক্ষমা করে দেই, যদিও তাদের পূর্বের পাপ পাহাড়তুল্যই হোক না কেন। আমার দয়া তোমাদের প্রতি অনেক বেশি এবং আমার শাস্তি অনেক কম, কেননা তোমরা আমার সৃষ্টি, আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তাই আমার দয়া তোমাদের সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার পানে যাওয়ার তৌফিক দিন, তাঁর তাক্বওয়া অর্জনকারী বানিয়ে দিন, নিজেদের ঈমান এবং বিশ্বাসে আমাদেরকে সংবদ্ধকারী বানিয়ে দিন, যাতে সর্বদা তাঁর দয়া থেকে আমরা অংশ লাভ করতে থাকি। কখনও যেন এমন সময় না আসে, যাতে আমরা তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হই এবং আমাদের অপকর্মের কারণে আমরা যেন তাঁর শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত না হই। আল্লাহ্ তা'লার দয়ার দৃষ্টি যেন সর্বদা আমাদের প্রতি নিবদ্ধ থাকে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)